গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা | ২৬ মে - ১ জুন ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন
৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

“রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা নজরুল না এলে ভারতবর্ষের নবজাগৃতি সম্ভব হত না, কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সমাজ মানসিকতা বা মনন, গণতান্ত্রিক চেতনা, যুক্তিবাদী মন কোনও কিছুই এ দেশে গড়ে উঠত না। এঁরা সেগুলি গড়ে তুলেছেন। অথচ মানবতাবাদের চিন্তাধারা আজকে পুরোপুরি শাসকশ্রেণির সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। এ কথার মানে কি এই যে, রবীন্দ্রনাথ জনগণের সম্পদ নন? অবশ্যই তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলন-বিরোধী দাঁত-নখ বের করছে তৃণমূল সরকার

সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স সহ নানা পেশার কর্মচারীরা ন্যায্য ডিএ এবং স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবিতে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তা ভাঙতে তৃণমূল সরকারের নখ-দাঁত বেরিয়ে এল। রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর ২০ মে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের অফিসের কাজের সময়ে অন্য কোনও কর্মসূচি চলবে না। এমনকি টিফিনের জন্য বরাদ্দ সময়েও তা চলবে না। যাঁরা তা করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। এমনকি তাঁদের সে দিন অফিসে গরহাজির বলেও ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীরা কর্মরত অবস্থায় কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদ করতে পারবেন না। স্বাভাবিক ভাবে এই পদক্ষেপকে অগণতান্ত্রিক বলে তীব্র নিন্দা করেছে কর্মচারীদের সংগঠনগুলি। শ্রমিক কর্মচারীরা আশঙ্কা করছেন এই ফতোয়ার দ্বারা রাজ্য সরকার কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।

এই সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২০ মে এক বিবৃতিতে বলেছেন, সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে মুখ্যসচিব যে সার্কুলার জারি করেছেন তা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। এর ফলে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের সংহতি মিছিল কলকাতায়

কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদের শাস্তির দাবিতে ১৮ মে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সংহতি মিছিল শুরু হয়ে এসপ্ল্যানেডে শেষ হয়। সভায় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা বক্তব্য রাখেন

পাঁচের পাতায় দেখুন

ট্রাম বাঁচাতে রাস্তায় নামার ডাক দিলেন বিশিষ্টজনেরা

কলকাতায় মাত্র দু-তিনটি রুটে কয়েকটি ছাড়া বাকি সব রুটে ট্রাম চালানো বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। যানজট, ট্রামের শ্লথগতি ইত্যাদি বলে কোথাও ট্রামডিপো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা চলছে ট্রাম কোম্পানির জমিতে। কোথাও আবার পিচ ঢেলে ট্রাম লাইনই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের কর্তা থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত সবার কাছে নাগরিকরা ট্রাম রক্ষার দাবি জানালেও তাতে তাঁদের কোনও আগ্রহ চোখে পড়েনি। ১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বহু বামপন্থী আন্দোলনের স্মৃতি বহনকারী কলকাতা ট্রামের এই দুর্দশায় সরব হয়েছেন সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্টজন। ট্রাম রক্ষার দাবিতে ২০ মে কলকাতার স্টুডেন্টস হলে এক নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা।

বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের সামাজিক অবমাননার জন্য সরকারই দায়ী

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি খারিজ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৯ মে এক বিবৃতিতে বলেন, নিয়োগ দুর্নীতির প্রশ্ন ছাড়াও হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি খারিজের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ফলে আপাতত তাঁরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু এই শিক্ষকদের সামাজিকভাবে বারবার যে অবমাননার শিকার হতে হচ্ছে তার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড তথা রাজ্য সরকার দায়ী।

এসইউসিআই(সি)-র দাবি, যাঁরা নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন তাঁদের চাকরি রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। অন্য দিকে যে সব যোগ্য প্রার্থীরা মাসের পর মাস রাস্তায় বসে আছেন তাঁদের দ্রুত চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

বাইরের কাউকে চা বাগানে দেখলেই হুমকি দেয় মালিক

পশ্চিমবাংলার মানচিত্র ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে, সমতল থেকে পাহাড়ি এলাকার দিকে এগিয়ে গেলে এক রাশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জীবনযাপনের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব চোখে পড়ে। আর এই উত্তরাঞ্চলে, প্রধানত ডুয়ার্স-তরাই, দার্জিলিং, আসাম প্রমুখ এলাকাগুলি প্রসিদ্ধ একটি বিশেষ কারণে— চা বাগান। যতদূর চোখ যায়, শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, কুয়াশা কিংবা ঝকঝকে রোদে চা বাগানের কচি পাতা দেখা যায়। সেই সৌন্দর্য-দৃশ্য ফুটে ওঠে ভ্রমণমূলক পত্রিকায়, আর টিভি-খবরের কাগজে, চা-কোম্পানির নানা বিজ্ঞাপনে। চোখ কেড়ে নেওয়া এই সৌন্দর্য প্লাবিত করে রাখে পাঠকের দর্শকের মনকে। চা-বাগানগুলো হয়ে ওঠে টুরিজমের আকর্ষণকেন্দ্র।

তারপরেও থেকে যায় অনেক প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো নিয়ে কিছু তরুণ শহরের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে উপস্থিত হয় শিলিগুড়ি সংলগ্ন নিশ্চিন্তপুর চা বাগানে। না, ঠিক চা বাগানে নয়, চা শ্রমিকদের গ্রামে। শুরু হয় প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান। স্পষ্ট হয় চিকন পাতার সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শ্রমিকদের নিপীড়ন। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এখন ট্যুরিস্টদের হটস্পট। সেখানে বিশাল শহর গড়ে উঠছে। বড় বড় উঁচু উঁচু ইমারত গড়ার হিড়িক পড়েছে। আর তা করতে গিয়ে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে একটা আস্ত চা বাগান। নিশ্চিন্তপুর চা বাগানেরও ভবিষ্যৎ দশাও একই হতে চলেছে বলেই মনে করেন শ্রমিকরা।

এই চা বাগানে ঢুকতে গেলে একটা খাল পেরোতে হয়। দৈনন্দিন জলের প্রয়োজনের অনেকটাই মিটিয়ে দেয় এই খালের জল। কিন্তু খানিক দূরে যে প্রাইভেট স্কুল আছে তার নোংরা জল এখন গড়িয়ে পড়ে এই খাল দিয়েই। এই জলের ওপর আর নির্ভর করা যায় না। তবুও

উন্নয়নের স্রোত! ড্রেনের মধ্য দিয়ে পানীয় জলের পাইপ

অবলীলায় বাচ্চারা খেলা করে সেই জলে। শ্রমিকদের গ্রামে ঢুকলে দেখা যায় টিন-অ্যাসবেস্টসের ঝুপড়ি। তার পাশে দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ। কিন্তু মাঠটা সমতল নয়। মাঝে মাঝেই খানিকটা উঁচু হয়ে গেছে। কাছে গেলে চেনা যায়, এটা আসলে সমাধিস্থল। ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী চা শ্রমিকদের এখানে সমাধি দেওয়া হয়। এই সমাধিস্থলের গা ঘেঁসে কোনও অতিপ্রাকৃত গল্পের মতো পড়ে আছে এক তাসের মাঠ। সারা মাঠ জুড়ে সবুজ ঘাসের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য তাস। গ্রামের একটি ছেলে জানায়, এখানে জুয়া খেলা হয় আর মদ খাওয়া হয়। বেলা গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এলে সমাধিস্থলের পাশে শুরু হয় এই অদ্ভুত মহাযজ্ঞ।

চা বাগানের বেশিরভাগ কর্মীই মহিলা। তা হলে পুরুষরা করেন কী? পুরুষদের একাংশ যারা যুবক তারা প্রায় বেশিরভাগই লিপ্ত থাকে এই মহাযজ্ঞে। চা বাগানে মদ পাওয়া যায় না। তাই সস্তায় ব্যবস্থা আছে হাড়িয়ার। কিন্তু এমন পরিস্থিতি কেন? শিক্ষা দীক্ষা নেই এখানে? গ্রামের একদিকে যে তাসের মাঠ, তার অপরপ্রান্তেই আছে জরাজীর্ণ একটা স্কুল। ছেলেমেয়েদের শৌচালয়ের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। মিড ডে মিলের জন্য তৈরি করা হয়ে পড়ে রয়েছে অর্ধসমাপ্ত সব অ্যাসবেস্টসের চাল দেওয়া ঘর। তার দেওয়ালে আঁকা অশ্লীল ছবি। ভগ্নস্তূপের মতো ছড়িয়ে আছে ইট আর সিমেন্ট— বেলা গড়ালে ওটা হয়ে ওঠে নেশাখোর আর মদ্যপদের আড্ডাখানা। এটিই 'স্কুল'। চা বাগানের অন্তর্গত আপার প্রাইমারি পর্যন্ত সরকারি স্কুলগুলো হয় বন্ধ হওয়ার মুখে, আর না হয় সেগুলির শোচনীয় দুরবস্থা।

একই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে, বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে চামটা চা বাগান। ঝাঁ চকচকে পিচ রাস্তার পাশে রোদে ঝলমল করছে বাগানটা। একটু হেঁটে গেলে ডান হাতে পড়বে মেফেয়ার রিসর্ট যেখানে এ বারের জি-২০ সামিটের ডেলিগেটদের থাকার জায়গা করা হয়েছিল। রিসর্ট পার হলে, পয়সাওয়ালাদের বিলাসিতার কেন্দ্র যেখানে শেষ, ওই পিচ রাস্তার সৌন্দর্যও সেখানেই শেষ। তারপর, ডান হাতে চা কারখানা, আর বাম দিকে শ্রমিকদের বস্তি। প্রতিটি চা বাগানে বংশানুক্রমে চলছে তাদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ট্রাম বাঁচাতে রাস্তায় নামুন, বললেন বিশিষ্টরা

একের পাতার পর

চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কনভেনশনে প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যক্ষ ডঃ নীলেশ মাইতি। ট্রামপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে হল ছিল ঠাসা।

ট্রাম তুলে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জোরালো মতামত দেন বিশিষ্ট বক্তারা। তাঁরা বলেন, শিশু, বয়স্ক, অসুস্থরা ছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য যান ট্রাম। দূষণহীন, পরিবেশবান্ধব এই যান বর্তমানে দূষণময় পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সব দেশ ট্রাম তুলে দিয়েছিল তারা আবার ট্রাম চালু করছে। বিশ্বের ৪০০টির বেশি শহরে ট্রাম চলছে। শুধু কনভেনশন নয়, ট্রাম বাঁচাতে হলে আমাদের সকলকে রাস্তায় নামতে হবে। এবং এমনভাবে নামতে হবে যাতে সরকারের টনক নড়ে— কনভেনশনে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন বিমল চ্যাটার্জী। বয়সের বাধাকে উপেক্ষা করে তিনি এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকবেন বলে জানান। প্রতুল মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা কলকাতার জলাভূমি হারিয়েছি, খোলামেলা পরিবেশ হারিয়েছি, এখন দূষণহীন ট্রামও বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার। অপরিকল্পিত নগরায়ণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

ট্রাম বিশেষজ্ঞ দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, ট্রাম তুলতে যানজটের অজুহাত দেওয়া হয়। অথচ যে রাস্তায় ট্রাম চলে না, সেখানে অন্য গাড়ির গতি কি খুব বেশি? তিনি বলেন, গাড়ি কিংবা বাস খারাপ হয়ে ট্রামরুটের উপর দাঁড়িয়ে গেলে কি সেগুলি তুলে দেওয়ার কথা ওঠে? তা না হলে ট্রাম তোলার কথা কেন? এক একটি ট্রাম ৭০-৮০ বছর চলে। তার পেছনে খরচও হয় অত্যন্ত কম। নানা কারণে ট্রাম দপ্তরে দুর্নীতিও কম। অথচ বেশি খরচের, দূষণ ছড়ানো বাসের পরিবর্তে ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সরকার নানা অজুহাত দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত যে সরকারের দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা, তা তিনি এক এক করে যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ট্রাম বন্ধ করার জন্য পরিবহণ দপ্তর এবং ট্রাম কোম্পানি একে অপরকে দোষারোপ করে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলছে।

তিনি আক্ষেপ করেন, কলকাতায় ট্রাম ডিপো রয়েছে, লাইন রয়েছে, ওভারহেড তার, সাবস্টেশন সহ ট্রাম চালানোর প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই রয়েছে। শুধু সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই আজ বন্ধ হতে বসেছে ট্রামের মতো অবশ্যপ্রয়োজনীয় পরিবহণ। অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সরকার যদি শ্বেতপত্র প্রকাশ না করে

কনভেনশনে উপস্থিত নাগরিকরা

তবে আমাদেরই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে, যা ট্রাম রক্ষার আন্দোলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, গোটা বিশ্ব পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতায় আতঙ্কিত। ভবিষ্যতের জন্য কি চরম দূষিত একটি পৃথিবী রেখে যাব আমরা? তা না হলে অবশ্যই ট্রাম বাঁচানোর দাবিতে আমাদের রাস্তায় নামতে হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে ভাবে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে দিচ্ছে, ঠিক সে ভাবেই রাজ্যের তৃণমূল সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত এই পরিবহণ ব্যবস্থাটির সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতে ট্রাম তুলে দিতে চাইছে। পূর্বতন সিপিএম সরকারও একই উদ্দেশ্যে ও নানা কায়েমি স্বার্থে ট্রাম তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। নাগরিকদের প্রতিবাদে সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। এখন তৃণমূল সরকার সেই দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। তরুণবাবু বলেন, এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে আমরা কলকাতার মেয়র এবং পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে যাব। ট্রাম রক্ষার দাবিতে যতদূর যেতে হয় আমরা যাব। সভায় উপস্থিত নাগরিকেরা সোচ্চারে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ট্রামের নিত্যযাত্রী, নিবন্ধকার সমরেন্দ্র প্রতিহার। উল্লেখ্য, একটি মাত্র রাজনৈতিক দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ট্রাম রক্ষার দাবিতে রাস্তায় নেমেছে। দলের কর্মীরা মহানগরী জুড়ে নাগরিকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। তাঁরা ইতিমধ্যে কোম্পানির দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছেন। আগামী ১ জুন পরিবহণ দপ্তর অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

কর্ণাটকে বিজেপি পরাস্ত
কিন্তু এতে তার দুষ্ট রাজনীতি পরাস্ত হবে না

‘সরকার যদি গ্যাসের দাম এভাবে বাড়িয়ে চলে, মন্দির আর আমাদের কী উপকার করবে?’— দিনের পর দিন বিপুল সাম্প্রদায়িক প্রচারের বন্যা সত্ত্বেও কর্ণাটক নির্বাচনে বিজেপির শোচনীয় হারের মূল কারণ এক কথায় বলতে গেলে রামনগরের বাসিন্দা কুমার গৌড়ার এই প্রশ্নটিকে বিনা দ্বিধায় বেছে নেওয়া যায়। ‘শোলে’ সিনেমাখ্যাত পাথুরে শিলাস্তরে ঘেরা কর্ণাটকের সেই রামনগর, যেখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে হাওয়া দিতে সদ্যপ্রাক্তন বিজেপি সরকার একটি ‘রাজকীয়’ রাম-মন্দির তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ওই পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন স্থানীয় মানুষটি। বাস্তবে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, দৈনন্দিন রুটি-রুজি সংক্রান্ত জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি সমাধানে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি সরকারের উদাসীনতা ও অপদার্থতাই কর্ণাটক নির্বাচনে বিজেপির এই লজ্জাজনক পরাজয়ের পিছনে কাজ করেছে।

দুর্নীতিকে সঙ্গী করেই

পথচলা শুরু বিজেপি সরকারের

নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কর্ণাটকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে সেখানে ১৯টি জনসভা, ৬টি রোড শো করেছেন। সাম্প্রদায়িক উস্কানিকে মূল হাতিয়ার করে প্রতিটি ভাষণের শেষে ‘জয় বজরংবলী’ হুঙ্কার দিয়েছেন। দিনের পর দিন মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন অমিত শাহ, জেপি নড্ডার মতো তাবড় বিজেপি নেতারা। সাম্প্রদায়িক বিভাজন, জাতপাত, সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে বিভেদের বিষ ছড়িয়েছেন তাঁরা। ভুয়ো প্রতিশ্রুতির লম্বা তালিকাও বিলিয়েছেন। কিন্তু ভোটের ফল স্পষ্ট করে দিল যে, রাজ্যের মানুষ সে সব প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখা গেল, ২২৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৬৬টি। ১৩৫টি আসন পেয়ে সরকার গড়ার সুযোগ পেয়েছে কংগ্রেস।

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর কর্ণাটকে সরকার গড়েছিল কংগ্রেস-জেডিএস জোট। এক বছর যেতেই দেদার টাকা ছড়িয়ে ক্ষমতালোভী বিধায়কদের কিনে নিয়ে নতুন সরকার গড়ে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হন ইয়েদুরাপ্পা। সরকারি গদি দখলের সেই কৌশলের গালভরা নাম ছিল ‘অপারেশন লোটাস’। শুরু থেকেই বিজেপি সরকারের অঙ্গ হয়ে যায় ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। দুর্নীতির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর নির্দেশ দেয় কোর্ট। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ইয়েদুরাপ্পাকে সরিয়ে তড়িঘড়ি বাসবরাজ বোম্মাইকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাতে বাধ্য হয় বিজেপি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বদল হওয়ার পর দুর্নীতি কমার বদলে আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। বিল মেটাতে সরকারি প্রশাসন ৪০ শতাংশ কমিশন চায়, এই অভিযোগ জানিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখেন এক কন্ট্রাক্টর। বোম্মাই সরকারের নামই হয়ে যায় ‘৪০ পার্সেন্ট সরকার’। এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি সমর্থক ঋণগ্রস্ত এক কন্ট্রাক্টর আত্মহত্যা পর্যন্ত করেন। এবারের নির্বাচনে রাজ্যের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়েছে।

সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা মেনে নেয়নি মানুষ

বিজেপিও জানত মানুষের ক্ষোভের আগুন চাপা দেওয়ার সাধ্য তাদের নেই। তাই দলের রাজ্য সভাপতি নলিন কুমার কাটিল প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, উন্নয়ন নয়— এবারের ভোটের মূল ইস্যু করতে হবে ‘লাভ জিহাদ’কে। টিপু সুলতানকে হিন্দুবিদ্বেষী সাজিয়ে ইতিহাসের নামে নতুন করে গল্প ছড়িয়েছিল বিজেপি। ভোটবাক্স ভরানোর লক্ষ্যে কর্ণাটকের প্রভাবশালী ভোক্কালিগা সম্প্রদায়কে খুশি করতে সেই সম্প্রদায়ের দুই কাল্পনিক নায়ককে টিপু সুলতানের হত্যাকারী হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করেছিল তারা। খোদ ভোক্কালিগাদের ধর্মগুরুরাই সেই মিথ্যা গল্পের বিরুদ্ধতা করেছেন। কর্ণাটকের বহু অঞ্চলেই টিপু সুলতান সম্পর্কে জনজীবনে যথেষ্ট সম্ভ্রম রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ তো দূর, খোদ বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের একাংশও এই মিথ্যাপ্রচার ভাল ভাবে নিতে পারেননি। এমনকি ভোটের ঠিক আগে মুসলিমদের একটি অংশের থেকে সংরক্ষণের সুযোগ কেড়ে তা ভোক্কালিগা ও লিঙ্গায়েতদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার টোপও কাজ দেয়নি। সংখ্যালঘুবিদ্বেষ ছড়াতে বিজেপি সরকারের হিজাব ও হালাল-মাংসে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মেরুকরণের চেষ্টাও জনগণের ক্ষোভ চাপা দিতে পারেনি। বিজেপি সরকারের যে মন্ত্রী হিজাব পরে স্কুলে আসায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, সেই বিসি নাগেশ ভোটে হেরেছেন। এমনকি হালাল-মাংস নিষিদ্ধ করা নিয়ে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়ানোয় প্রবল উৎসাহী ছিলেন যে বিজেপি নেতা, সেই সিটি রবিরও এবার ভরাডুবি হয়েছে কোডাগু কেন্দ্রে। অথচ কর্ণাটকের যে অল্প কয়েকটি অঞ্চল হিন্দুত্ববাদীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত, কোডাগু কেন্দ্রটি সেখানেই।

শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে

স্কুলস্তরের ছেলেমেয়েদের দলীয় সংকীর্ণ ভাবধারায় জারিত করতে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পাল্টে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল বিজেপি সরকার। এই উদ্দেশ্যে আরএসএসের বেছে দেওয়া কয়েকজনকে নিয়ে তৈরি করেছিল ‘টেক্সটবুক রিভিশন কমিটি’। শহিদ ভগৎ সিং, নারায়ণ গুরু, ১২ শতকের সমাজ-সংস্কারক বাসবান্নাকে সিলেবাস থেকে বাদ দিয়েছিল কমিটি। নবজাগরণের কবি কুভেম্পু, আম্বেদকরের ভূমিকা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলি কাটছাঁট করেছিল। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। রাজ্য জুড়ে জোরদার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকারের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে তারা। কর্ণাটকের সাধারণ মানুষ যে বিজেপির এই অশুভ প্রচেষ্টা মেনে নেননি, ভোটের ফলে তা পরিষ্কার হয়েছে। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সেখানকার শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সহ নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনেরাও। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ‘সেভ এডুকেশন কমিটি’-র নেতৃত্বে কর্ণাটকের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনটিও গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক, আধুনিক শিক্ষা ধ্বংসকারী বিজেপির ঘৃণ্য চেহারা রাজ্যের মানুষের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থায়

কর্ণাটকের জনজীবন বিপর্যস্ত

প্রশ্ন হল, বিপুল অর্থ খরচ করে লাগাতার প্রচারের জাঁকজমক সত্ত্বেও কেন বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাত ও সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে বিভেদ তৈরির চেষ্টা ভোটের অর্থে পুরো কাজ দিল না? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত কর্ণাটকের জনজীবনের অসহনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কল্যাণে বাঙ্গালোরের মতো শহরগুলির কিছুটা চাকচিক্য থাকলেও তার বাইরে কর্ণাটক জুড়ে দারিদ্র প্রবল। মানব উন্নয়ন সূচকে দেশের মধ্যে যথেষ্ট পিছনে রয়েছে এই রাজ্য। ২০২২-এর সরকারি হিসেবে, প্রতি ১ হাজারটি সদ্যোজাতের মধ্যে এ রাজ্যে মারা যায় গড়ে ২০টি শিশু। নীতি-আয়োগের তৈরি করা ২০২১ সালের দারিদ্রের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, কর্ণাটকের ৩৪ শতাংশ মানুষ যথাযথ পুষ্টি পান না। এই হিসাবে দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে কর্ণাটক। এ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির মানুষ তুলনায় আরও বেশি দরিদ্র। চিত্রদুর্গ, বেলারি, রাইচুর, গুলবর্গা, বিদার ইত্যাদি গ্রামীণ কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে চাষের জন্য জলসেচের চরম অভাব। পরিকাঠামোর হালও ভাল নয়। নতুন কল-কারখানা তৈরি না হওয়া ও চালু কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ কৃষিক্ষেত্রই রাজ্যের কর্মসংস্থানের মূল ভরসা। কিন্তু জলসেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির অভাবে এবং ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় আর্থিক দুর্দশা কৃষকদের পিছু ছাড়ে না। চাষের কাজের ফাঁকে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে তাদের কাছে। ফলে কর্ণাটকে বছরে বছরে বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। জাতীয় গড়ের তুলনায় বেকারত্বের হার কম কর্ণাটকে। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিক, কর্পোরেট সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক এমনকি সরকারি কাজে যুক্ত ঠিকা-কর্মচারীদের মজুরি বা বেতন নিতান্তই সামান্য। জামাকাপড় তৈরির কারখানার মহিলা শ্রমিক, অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকা, ঠিকায় কাজ করা পৌরকর্মী সহ রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধি ও কাজের নিয়মিতকরণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি রাজ্যের বিজেপি সরকার শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার তোয়াক্কা না করেই শ্রমিকদের কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করে দেয় যা খেটে-খাওয়া মানুষের মনে বিপুল ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

২০২০ সালে বিজেপি সরকার গো-হত্যা নিবারণী আইন করার পর থেকে গো-রক্ষক বাহিনীর রমরমা বাড়তে থাকে রাজ্যে। সাথানুরে গোরক্ষক বাহিনীর হাতে এক সংখ্যালঘু মানুষের মৃত্যুও হয়। এতে ভোটে সুবিধে পাওয়ার বদলে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে এলাকার মানুষ বিজেপির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গবাদি পশুর মেলায় আতঙ্কিত মুসলিমরা আসতে চান না বলে গত কয়েক বছর ধরে কর্ণাটকে পশু কেনাবেচার বাজারের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পরিণামে আর্থিক দুর্দশা আরও বেড়ে গেছে কৃষক পরিবারগুলির।

‘বাম’ নামধারী দলগুলির সুবিধাবাদী আচরণ

সব মিলিয়ে বিজেপি সরকারের অপশাসনে বিরক্ত কর্ণাটকের সাধারণ মানুষ গত কয়েক বছর ধরে সত্যিকারের একটি বিকল্প খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একজোট করে রাজ্য জুড়ে জনজীবনের নানা দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার এটাই উপযুক্ত সময়— এ কথা বুঝে এসইউসিআই(সি) বামপন্থী দলগুলির সংগ্রামী জোট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল কর্ণাটকে। এই উদ্দেশ্যে সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এমএল)-লিবারেশন, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরপিআই এবং স্বরাজ ইন্ডিয়ার সঙ্গে জোট করে এসইউসিআই(সি) বেশ কিছু আন্দোলন চালায়। জনগণের দাবিপত্র তৈরি করে, ছাপিয়ে তা ব্যাপক ভাবে বিলি করাও হয়। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণার পরেই, ‘যে কোনও উপায়ে বিজেপিকে পরাজিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি’— এই অজুহাত দেখিয়ে, আসলে যে কোনও উপায়ে বিধানসভায় কিছু আসন পাওয়ার লোভে সুবিধাবাদীর মতো সিপিআই দ্রুত হাত মেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে এবং কংগ্রেস ও জেডিএস-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় চলে যায় সিপিএম। তিনটি আসনে জেডিএস সমর্থনও করে সিপিএম-কে। এই অবস্থায় এসইউসিআই(সি) একাই জনজীবনের দাবিগুলি নিয়ে নির্বাচনে ১৪টি আসনে লড়াই করেছে।

বিজেপি অপশাসনের বিরুদ্ধে জনরোষ কংগ্রেসের ভোটের ঝুলি ভরিয়েছে

রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বুঝে আসরে নামে কংগ্রেস। ভোটে জিতলে জনগণকে দেদার খয়রাতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারে নামে তারা। শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার নীলনক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহার, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, সরকারি দফতরের সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, কৃষকদের জন্য বিনাসুদে ঋণ ইত্যাদি যে ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে এসইউসিআই(সি) দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে, সেই দাবিগুলিও পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি সরকারের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে সভা

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলনের দিশারি শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৪ মে সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে মেচেদা বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনের রোকেয়া হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচক ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। তিনি শিবদাস ঘোষের গৌরবোজ্জ্বল, সংগ্রামবহুল বিপ্লবী জীবনের নানা দিক ও ভারতের শোষণমুক্তির সংগ্রাম বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং ৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মশতবর্ষের সমাপনী সভা সফল করার আহ্বান জানান। তিনি শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আত্মস্থ করা ও শোষিত মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির উপদেষ্টা ফণীভূষণ চক্রবর্তী, সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মাজী, সম্পাদক মধুসূদন বেরা প্রমুখ।

এআইডিওয়াইও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে 'যুব জীবনের সমস্যা, উত্তরণ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা' শীর্ষক সভায় আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল ও কমরেড অনুরূপা দাস, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চিন্ময় ঘোড়াই, এআইডিওয়াইও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ইনচার্জ স্নেহলতা সাউ।

উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিই বাদ!

প্রতিবাদ এ আই ডি এস ও-র

উপাচার্য বাছাইয়ের সার্চ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি না রেখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি রাখার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ১৫ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য বাছাইয়ের সার্চ কমিটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিকে বাদ দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার ধ্বংস করার এক গভীর চক্রান্ত।

তিনি বলেন, ইউজিসির প্রস্তাবিত সার্চ কমিটিকে অগ্রাহ্য করার এই প্রবণতা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। শুধু তাই নয়, সার্চ কমিটি যাতে রাজনৈতিকভাবে রাজ্য সরকারের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও আরও একজন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিকে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এআইডিএসও বলেছে, এই সিদ্ধান্ত আমলাতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কমরেড বিশ্বজিৎ রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দায়িত্বশীল পদাধিকারী নির্বাচনে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও স্বাধিকার সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল, তার বিপরীতে পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতোই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার শিক্ষায় আমলাতন্ত্র ও দলতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করছে। এই অর্ডিন্যান্স বাতিল করে, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানান তিনি।

➤ ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি অ্যাবেকার

১৫ মে সন্ধ্যায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যুতের খুঁটি মাথায় পড়ে পূর্ব মেদিনীপুরের সিদ্ধা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীধরবসান গ্রামের আশরাফ খান প্রাণ হারান। তিনি দৈনিক মজুরির ড্রাইভার হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর অসহায় পরিবারকে অন্তত ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ সাহায্য দেওয়ার দাবি জানিয়ে ১৬ মে অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) -র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার এবং জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

➤ জেলাশাসককে স্মারকলিপি এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কয়েক দফা দাবিতে ১৮ মে জেলাশাসকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দাবিগুলির মধ্যে ছিল— কোলাঘাটে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত আশরাফ খানের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ও ঝড়ে আহত চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের উপযুক্ত সাহায্য, ক্ষতিগ্রস্ত সব বাড়ির মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ফুল ও পানচাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা উত্তর সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ দাস, সুব্রত দাস, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সনাতন গিরি, অনুপ মাইতি প্রমুখ।

➤ একবালপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবি

১৪ মে কলকাতার একবালপুরে তড়িদাহত হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। অ্যাবেকা কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে সিইএসসি এবং পুরসভা একে অপরের দিকে দায় ঠেলছে, কিন্তু এরা কেউই দায় অস্বীকার করতে পারে না।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ চুরি রুখতে কলকাতা পুলিশ, সিইএসসি ও পুরসভার নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে শহরবাসীর জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি করা হয়। অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবিও জানানো হয়।

লাশের পর লাশ বাড়ে, তবু সরকার বন্ধ করে না অবৈধ বাজি কারখানা

পোড়া মাংস আর বারুদের তীব্র গন্ধে এগরা মহকুমার খাদিকুল উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। গত ১৬ মে ভরদুপুরে কৃষ্ণপদ বাগ ওরফে ভানু বাগের অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের শব্দে চারিদিক কেঁপে ওঠে। দলা পাকানো উঁচু হয়ে ওঠা ধোঁয়ার দৃশ্য বহু দূরের মানুষজনও দেখে আঁতকে উঠেছেন। বিস্ফোরণে কারখানার টিনের চাল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বেশ কয়েকজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে পাশের এক পুকুরে। স্বজন হারানো কান্নায় চারপাশ ভারী হয়ে উঠেছে। মর্মান্তিক বিস্ফোরণ কেড়ে নিয়েছে ৫ জন মহিলা সহ ১২টি তাজা প্রাণ। বিস্ফোরণের তীব্রতায় এলাকার মানুষের ধারণা, শুধু বাজি নয় অবৈধভাবে বোমাও তৈরি হত এই কারখানায়।

স্বজন হারানো মানুষের সাথে কথা বলছেন দলের প্রতিনিধিরা

এর আগেও বাজি কারখানার জন্য সাধুয়াপোতা, নারুয়াবিলা, পশ্চিম ভাঙামারি, হিরাকুনিয়া পুরুন্দায় বিস্ফোরণ হয়েছে। খাদিকুলে কেবল প্রথমবার এই বিস্ফোরণ ঘটল তা নয়, ১৯৯৫ সালে সিপিএম আমলে ওই ভানু বাগেরই কারখানায় বিস্ফোরণ প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল পাঁচ জনের। সিপিএম প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ২০০১ সালে এই কারখানায় আবার বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাণ যায় তিনজনের। আর এবার মৃত্যু হল ১২ জনের। ভানু বাগ নিজে পালিয়েও বাঁচতে পারেনি। বিস্ফোরণের আগুন তার প্রাণ কেড়ে নিল ঘটনার তিন দিন পর।

দুর্ঘটনার পরদিনই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের উদ্যোগে এগরা মহকুমা শহরে বিক্ষোভ মিছিলের পর এসডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পর দিন গোটা জেলা জুড়েই শোকবেদি করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবং এই অবৈধ কারখানা বন্ধের দাবিতে পথসভা হয়। দলের পূর্ব মেদিনীপুর (দক্ষিণ) জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অশোকতরু প্রধান সহ চার জনের প্রতিনিধি দল স্বজনহারানো মানুষের কাছে গিয়ে সহমর্মিতা জানান।

এত ক্ষয়-ক্ষতি, মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিয়ে এ সব বন্ধে কোনও সরকারই উদ্যোগ নেয়নি। সরকারের চোখের সামনেই ভানু বাগের মতো অসংখ্য অবৈধ বাজি কারখানা চলছে রমরমিয়ে। পুলিশ-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এই বাজি কারখানা অবৈধভাবে চলতে পারে?

খাদিকুলের বিস্ফোরণের ৫ দিন পর আবার বিস্ফোরণ ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজে। সেখানে মৃত্যু হয় ৩ জনের। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার সাথে কি অবৈধ বাজি কারখানার কোনও সম্পর্ক আছে? আগামী নির্বাচনকে রক্তাক্ত করার জন্যই কি তৈরি হচ্ছিল বোমা? প্রতিনিধি দলের কাছে মানুষজনেরা বলেছেন আর কত জনের প্রাণ বলি হলে বন্ধ হবে এই অবৈধ কারখানা?

এক প্রতিনিধিকে জড়িয়ে ধরে একজন অসহায়, সদ্য স্বামীহারা গৃহবধূ প্রশ্ন করেন, আমরা বাঁচবো কী করে? এ ব্যবসা চিরতরে বন্ধ হবে কী করে? তখন ওই প্রতিনিধির মুখ থেকে একটাই শব্দ উচ্চারিত হয়েছে 'প্রতিবাদ'। প্রতিবাদই যে কোনও সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ। প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড অশোকতরু প্রধান বলেন, আপনারা এই শোককে শক্তিতে পরিণত করুন, ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই অবৈধ বাজি কারখানা বন্ধের দাবিতে গণকমিটি গঠন করে আন্দোলন করুন। এলাকায় গণজাগরণ ঘটিয়ে বাজি কারখানাকে সমূলে উচ্ছেদ করুন। মানুষ এই মৃত্যু-ব্যবসা চায় না।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে স্মারকলিপি

পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল থৈ থৈ করে। রাস্তাটি মেরামতের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র মেচেদা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ মে মেচেদা বাসস্ট্যান্ড কমিটির সভাপতি তথা তমলুক মহকুমা শাসকের কাছে কয়েক শত মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত দাস, কার্তিক শী, জগন্নাথ মণ্ডল, রবিন হাজরা, গৌতম সামন্ত।

যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদের শাস্তির দাবিতে

সর্বত্র প্রতিবাদ

আগরতলা ঃ মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং-কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার, তার সাংসদ পদ খারিজ ও রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি পদ থেকে অপসারণ এবং দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও কুস্তিগিরদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে নানা সংগঠনের ডাকে দেশের সর্বত্র সংহতি মিছিল হয়। ১৯ মে ত্রিপুরার আগরতলার বটতলায় বিক্ষোভ দেখায় এআইএমএসএস।

আগরতলা, ত্রিপুরা

মেদিনীপুর শহর

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী শিবানী ভৌমিক।

মেদিনীপুর ঃ ২১ মে মেদিনীপুর শহরে ক্রীড়াবিদ-ক্রীড়াপ্রেমী- বিশিষ্টজনদের আহ্বানে সংহতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের আহ্বান রেখেছিলেন ক্রীড়াবিদ রামানন্দ মুখার্জী, জগবন্ধু অধিকারী, অমিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মিছিলে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিমল মাহাত, অর্জুন কুণ্ডু, তপন ভকত সহ শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সংহতি মিছিল কলকাতায়

কলকাতার সংহতি মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ফুটবলার কম্পটন দত্ত, গোষ্ঠ পালের পুত্র প্রাক্তন ফুটবলার নীরাংশু পাল, ইন্দ্রনাথ পাল, অলিম্পিয়ান প্রশান্ত কর্মকার, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, ফুটবলার সুমিত মুখার্জী, পার্থ দত্ত, অ্যাথলেট ববি ঘোষ, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রখ্যাত আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, রঞ্জি ক্রিকেটার অরিন্দম দাস, প্রখ্যাত সাঁতারু রবিন বোলদে, যূথিকা পাল, ওয়েস্টবেঙ্গল ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রথীন রায়চৌধুরী, ডাঃ অশোক সামন্ত, সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গোষ্ঠ পাল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক সামসুল আলম, নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মলয় পাল প্রমুখ।

পুরুলিয়া উক্ত সাংগঠনিক জেলায় এআইডিএসও-র উদ্যোগে আনাড়া অঞ্চলে ভলিবল টিমের পক্ষ থেকে সংহতি মিছিল

বিধাননগরে ছাত্র-যুব-মহিলাদের উদ্যোগে মোমবাতি মিছিল

সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে ১৮ মে মৌলালির প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস (ইনসেটে)

পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে

আসামে বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলন

আসামের বিজেপি সরকার গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার স্থাপন ও বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের চক্রান্ত করছে। এর বিরুদ্ধে ১৫ মে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছাড় জেলা কমিটি ডাক দিয়েছিল নাগরিক মিছিলের। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে শহরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সমবেত হন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক-আইনজীবী সহ কয়েক শত সাধারণ মানুষ।

২০২১ সালের ১৭ আগস্ট কোভিড পরিস্থিতির সুযোগে বিদ্যুৎক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত গ্রাহকের মিটারকে স্মার্ট মিটারের দ্বারা প্রতিস্থাপনের নির্দেশ জারি করে। আসাম সরকার রাজ্যের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা এপিডিসিএল-কে দিয়ে অত্যন্ত কৌশলে এই নির্দেশ কার্যকর করতে শুরু করে। প্রথমে গ্রাহকদের প্রচলিত ডিজিটাল মিটার বদল করে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। তার দু-তিন দিনের মধ্যেই মোবাইলে মেসেজ পাঠানো শুরু করে যে স্মার্ট মিটারকে প্রিপেড করা হয়েছে এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিচার্জ না করলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। অন্য দিকে যারা বাধ্য হয়ে প্রিপেড স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপন করেছেন তাদের বিদ্যুতের বিল আগের তুলনায় দ্বিগুণ, তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিপায়। ফলে এর বিরুদ্ধে জনমনে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়।

অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এই মিছিলে বিশিষ্ট নাগরিক ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। মিছিল আটকাতে বিজেপি সরকার পুলিশ পাঠায়। পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরে যেতে চাপ দিতে থাকে। সংগঠনের রাজ্য শাখার অন্যতম আহ্বায়ক অজয় আচার্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর নামিয়ে আনা অত্যাচার প্রতিরোধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যের পর নাগরিকরা মিছিল শুরু করলে পুরুষ পুলিশ কর্মীরা মহিলা আন্দোলনকারীদের টানা হেঁচড়া করতে শুরু করে। এতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। টানা-হেঁচড়ায় বহু আন্দোলনকারী আহত হলেও মিছিল আটকানো যায়নি। পুলিশি বাধাকে উপেক্ষা করে নাগরিকেরা জেলাশাসক কার্যালয়ের দিকে এগিয়ে যান। জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ ও স্লোগান চললেও প্রথমে স্মারকপত্র নিতে কেউ রাজি হননি। নাগরিকদের প্রবল চাপে শেষ পর্যন্ত জেলাশাসক স্মারকপত্র গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের পর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মানুষ অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনর সাথে যুক্ত হয়ে এলাকায় এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

বাগনানে আশাকর্মীদের সভা

কাজের অস্বাভাবিক চাপে আশাকর্মীরা খুবই অসহায় অবস্থায়। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রয়োজনে আশাকর্মীদের সেন্টারে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁদের কাজের নিরিখে নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে না। মোবাইল দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এখনও দপ্তর বহির্ভূত কাজ যেমন, ভোট, খেলা, মেলা, পরীক্ষায় ও দুয়ারে সরকারের ডিউটি, ন্যাপকিন বিক্রি এ রকম বহু অতিরিক্ত কাজ করানো হচ্ছে। ইনসেনটিভের জন্য বহু আইটেমে এমন শর্ত রাখা হয়েছে যার ফলে কাজ করেও টাকা পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে আশাকর্মীরা ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসাবে ১৫ মে, বাগনান-২ ব্লকের আশাকর্মীরা খাজুনান শিবতলায় এক সভার আয়োজন করেন।

এই সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন ও হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভানেত্রী মধুমিতা মুখার্জি। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসির জেলা সংগঠক নিখিল বেরা।

হুমকি দেয় মালিক

দুয়ের পাতার পর

শোষণ। তারই মাঝে জীবন রক্ষা করতে গিয়ে ন্যূনতম প্রয়োজন যে জলের, সেই জলের পাইপ আসে হাইড্রেনের ভেতর দিয়ে। একটি স্কুল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে। সে কাজ মাঝপথেই বন্ধ, আর তার পাশে এখন পড়ে আছে প্লাস্টিকের গ্লাস, আর মদের বোতল। ২২-২৩ বছরের এক যুবক নিজের হাতখানি দেখিয়ে বলে, 'দেখো'। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শ্রমের চিহ্ন কী ভাবে ছাপ ফেলে রেখেছে তাদের শরীরের ওপর। অনর্গল বলে যায়, ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে না চা বাগানের রোজগারে। বাড়ির যুবকদের, পুরুষদের সন্ধান করতে হয় বিকল্প জীবিকার। তাই তারা চলে যায় বাইরে, অন্য রাজ্যে, হয়তো অন্য দেশে শ্রমিক হিসেবে। আছে সেই যুবকরাও যারা বেলা গড়ালে ওই তিন মাথার মোড়ে বসে মদ খায়, আর ড্রেনে শৌচ করে। আর সেই জল গড়িয়ে আসে নিচের গ্রামের মধ্য দিয়ে। 'আমাদের মা কাকিমাদেরকে ওই ড্রেন থেকেই জল ভরতে হয়'। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর কথার স্পর্ধায় ফুটে ওঠে ক্ষোভ। সে বোঝে একেই শোষণ বলে, সে জানে একে মানুষের মতো বাঁচা বলে না, সে জানে একে বেঁচে থাকা বলে না।

জঙ্গলে ঘেরা নকশালবাড়ি চা বাগান আয়তনে প্রায় ৮০০ একর। তার বেড়ার মধ্যে আছে প্রায় ৮টা গ্রাম। ওই ৮০০ একরে মানুষ থাকে, চিতা বাঘ থাকে, হাতিও থাকে— সহাবস্থান। তাদের বেশিরভাগ মানুষ জানে না বাইরের জগৎ সম্পর্কে বিশেষ কিছু। পশুপাখি আর মানুষ সব একই খাঁচায় বন্দি। একটি ছেলে ওখানকার গ্রামেই থাকে, বিকেল হলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বন্ধুদের সাথে, চা বাগানের মধ্যেই। সে ছবি আঁকতে ভালোবাসে, সে ছবি আঁকে। কিন্তু ভালবাসার মধ্যে থেকে জন্ম নেওয়া এই গুণের বিশেষ কদর নেই, কারণ ওখানে এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তাই, এ ক্ষেত্রে ও একা। ওখানকার একটি মেয়ে, ইতিহাস নিয়ে পড়ে, গ্রামের প্রথম শিক্ষিত। সে শুনিয়ে দেয় মদ প্রচলনের ইতিহাস, শুনিয়ে দেয় ১৯২০ থেকে ছোটনাগপুরের চা বাগানের শোষণের ইতিহাস। বুঝিয়ে দেয়, এই চা বাগানের অন্তরালে চলা শোষকদের পরিকল্পিত শোষণ ব্যবস্থার আঙ্গিকগুলো। ও বোঝে। কিন্তু সকলে বোঝে না। তারা যে জানে না, এর পেছনেও কারণ রয়েছে। চা বাগানের মালিকরা যারা এক সময় এই সব জমি সরকারের থেকে লিজে নিয়েছে, তারা নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই এক প্রকার শাসন চালায় এখানে। বাইরের কারওর প্রবেশকে ভাল চোখে দেখে না। পুলিশ ডাকার ভয় দেখায়। মালিকের ভয়ে তটস্থ থাকে শ্রমিকরা। শ্রমিকদের চিরকাল বেঁধে রাখার পরিকল্পনা চলে।

শ্রমিকরা প্রায় সবাই জানে তারা কোন বর্বরতার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু, 'এখানে আমরা সবাই সবটা জানলেও, ঐক্যের খুব অভাব'— হাসখোয়া চা বাগানের এক কর্মী বলে ওঠেন। গ্রামে নেই জলের ব্যবস্থা, নেই বেসিক স্যানিটেশন। সরকার এক বস্তা সিমেন্ট দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে একটা আস্ত টয়লেট। এমনই তার হাল যে জল ঢাললেই বোধহয় ধসে পড়ে যাবে। এক শ্রমিক নিজের টাকা খরচ করে বানাচ্ছেন টয়লেট। এতে ওনার উপার্জনের যে অংশ ব্যয় হবে, তাতে পেটে টান পড়বে। কিন্তু কোমরের সমস্যা, ডাক্তার বলেছে ওনার ইন্ডিয়ান টয়লেট ব্যবহার করা যাবে না। তাই, নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। জলের ওভারহেড ট্যাঙ্ক বসানো শুরু হয়েছিল কিছু বছর আগে, বরাদ্দ ছিল ১১ লক্ষ টাকা। সে কাজ অসম্পূর্ণ, এক নিরাকার নিরেট স্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। তার নীল সাদা রংটা চকচক করছে মাত্র। বাগানের পাইপলাইনে যে জল আসে, তার আসার সময়ের কোনও ঠিক নেই। এলেও, জল পড়ে সুতোর মতো।

রাজনীতি? আছে। আছে বিজেপি, আছে তৃণমূল, আছে সিপিএম। তারা কী করে? শ্রমিকরা বলেন এদের নেতাদের বেশ ভাল ভাব বাগানের বাবুদের সাথে। আর কিছু না। এক বাক্যেই শেষ হয়ে যায় ওই রাজনীতির অবস্থা-ব্যবস্থা। বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকে শ্রমিকদের ওপর শোষণ-অত্যাচার। মতের পার্থক্য হলে, সংঘাত হলে, মানুষ খুন পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার খবর হাওয়ায় হারিয়ে যায়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র গার্ডিয়ানে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে কেমন করে প্রলোভন দেখিয়ে চা বাগানের যুবতীদের পাচার করে দেওয়া হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, কখনও কখনও বিদেশেও। দেহ ব্যবসায় বিক্রি করে দেওয়া হয় তাদের। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর চা বাগান সংলগ্ন বন জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে হয় বাগানকে আরও বড় করার জন্য, না হয় নতুন চা বাগান খোলার জন্য। ফলে জঙ্গলের বাঘ ঢুকে পড়ে গ্রামীণ বসতিতে। গবাদিপশুর ছিন্ন ভিন্ন দেহ পড়ে থাকে, কখনও কখনও আস্ত মানুষকে টেনে নিয়ে চলে যায় অন্ধকারে। রক্তাক্ত ঘায়ের উপর অঝোরে কান্নার স্রোত এসে পড়ে, আর তারপর ভ্রমণ পত্রিকার চকচকে কাগজের ওপর দেখা যায় বিজ্ঞাপন— টিভির পর্দায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারায়, সেতার বাজিয়ে দর্শকের কাছে পরিবেশন করা হবে তাজমহল চায়ের সৌন্দর্য। তকমা দেওয়া হবে 'ফ্লেভার অফ দার্জিলিং'। আর মানুষ— সে তো কোনও দিন ছিলই না বেঁচে!

কর্ণাটকে বিজেপি পরাস্ত

তিনের পাতার পর

স্বৈরাচারী অপশাসন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কর্ণাটকের জনসাধারণের ক্ষোভ, জনস্বার্থবাহী কোনও বিকল্প না থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে চলে যায়।

সরকার বদল হলেই সাম্প্রদায়িকতা দূর হয় না

সব মিলিয়ে এ কথা বলাই যায় যে, কর্ণাটক রাজ্য জুড়ে হিজাব, হালাল ও টিপু সুলতানকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির বিজেপির চিরাচরিত ভোট-কৌশল আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস কি এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য শক্তি? কর্ণাটকে ঘৃণার বাজার বন্ধ হল আর ভালবাসার দোকান খুলে গেল বলে রাহুল গান্ধী সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছেন। কথাগুলি শুনতে ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু নরম হিন্দুত্বের লাইন অনুসরণ করে বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কার্যত কিছুই বলেনি। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের রক্ষক হিসাবে বিজেপির মতোই কংগ্রেসও যে পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যতম প্রিয় রাজনৈতিক দল, অতীতে তার প্রমাণ বহুবারই পাওয়া গেছে। একচেটিয়া মালিকের মুনাফার স্বার্থে খেটে-খাওয়া মানুষের উপর শোষণ-জুলুম চালাতে তারা যে কারও চেয়ে কম যায় না, রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনে দাঙ্গা বাধানোর বা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর বহু ঘটনাই যে তাদের ঝুলিতে আছে, তা-ও দেশের মানুষের অজানা নয়।

ফলে জয়ের প্রাথমিক উল্লাস থিতিয়ে গেলে কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার যে চিরাচরিত কায়দায় কর্পোরেট স্বার্থবাহী জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করা শুরু করবে এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। ফলে জলকল্যাণমুখী প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষা করতে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে নতুন সরকার যাতে বাধ্য হয়, জনগণকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। তা ছাড়া, শুধু সরকার বদলে জনমানস থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সমাজজুড়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবিরাম চর্চা ও জনজীবনের দাবিগুলি নিয়ে ব্যাপক গণআন্দোলন। নিছক ভোট-রাজনীতি নয়, একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তাতেই তা সম্ভব।

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

জনগণের সম্পদ। সম্পদ এই অর্থে, যদি আমরা বুঝতে পারি যে, আজকের যুগের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে মানবতাবাদের সীমা এবং সে অর্থে মানবতাবাদী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার সীমা নির্দেশ করে তার থেকে এগিয়ে গিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম আমাদের দিতে হবে। এ-ও আমাদের বুঝতে হবে যে, বুর্জোয়া মানবতাবাদের যেটা বিপ্লবাত্মক ধারা তার ধারাবাহিকতাতেই সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম হবে। তবুও রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সর্বহারা বিপ্লববাদের জমি তৈরি করেছে, এ কথাকে অস্বীকার করা যাবে না। তার কারণ এই যে, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া মানবতাবাদ সর্বহারা মানবতাবাদের জমি তৈরি করে। সেই জমি মানবতাবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন এবং সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং অশেষ পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর দান ভারতবর্ষের শ্রমিক বিপ্লবও অস্বীকার করতে পারবে না— যদি না শ্রমিক বিপ্লবীরা এভাবে ভাবেন যে, তাদের বিপ্লবের তত্ত্বটা আকাশ থেকে পড়েছে। কোনও সর্বহারা বিপ্লবী, কোনও সাম্যবাদী, কোনও শ্রমিক বিপ্লবী— যতদূর আমি জানি, লেনিন থেকে আরম্ভ করে মাও সে তুঙ পর্যন্ত— যাঁরা যে দেশে যখন বিপ্লব করেছেন, তখন তাঁদের কেউই এই ভাবে ভাবেননি। তাঁরা সব সময়ই ভেবেছেন অতীতের সমস্ত চিন্তানায়করা তাঁদের যুগের বা চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই আন্দোলনের দ্বারা সমাজটাকে যতদূর এগিয়ে দিয়েছেন, সেইটিই তার পরবর্তী সমাজব্যবস্থা গঠন করার জমি তৈরি করেছে। এই অর্থে সমস্ত যুগের অগ্রসর বিপ্লববাদ হচ্ছে অতীতের সমস্ত মনীষী এবং সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনগুলিরই উত্তরসূরি।"

নবজাগরণ, রবীন্দ্রনাথ ও বর্তমান সাংস্কৃতিক আন্দোলন

শিবদাস ঘোষ রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড

আন্দোলন বিরোধী দাঁত-নখ

একের পাতার পর

অর্জিত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হল, যা অভিসন্ধিমূলক। ডিএ সহ নানা দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে সরকারি কর্মীরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন—তা বানচাল করার জন্যই যে এই সুচতুর পদক্ষেপ তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। আমরা এই কালা সার্কুলারের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঞ্চের নেতৃত্বে শহিদ মিনারের তলায় চলছে লাগাতার অবস্থান। ১০ মার্চ সরকারি কর্মচারীরা যে ধর্মঘট পালন করেন তা রাজ্যজুড়ে সর্বাত্মক রূপ নেয়। স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনের চাপে প্রশাসন খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনে লাগাম পরাতেই এমন প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি। একদিকে কর্মচারী সংগঠনগুলি, অন্য দিকে গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিমাত্রেই এর প্রতিবাদ করেছেন। এই পদক্ষেপকে মুখ্যমন্ত্রীর চূড়ান্ত স্বৈরাচারী মনোভাবেরই প্রকাশ বলে তাঁরা মনে করেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ মিত্র বলেন, ক'দিন আগেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি জানিয়েছেন, আন্দোলন সরকারি কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তা সত্ত্বেও এই বিজ্ঞপ্তি বিস্ময়ের। তিনি বলেন, আন্দোলনে অংশ নেওয়ার 'অপরাধে' সরকার কর্মচারীদের যথেচ্ছ ভাবে শাস্তিমূলক বদলি করছে। সরকার যতই এ ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ নেবে কর্মচারীদের আন্দোলন ততই ছড়িয়ে পড়বে। তিনি বলেন, কর্মচারীরা যে কোনও মূল্যে এই সিদ্ধান্তকে প্রতিরোধ করবেন।

আসলে যে দলই সরকারে থাকে তারাই পুঁজিপতিদের সেবাদাস হিসাবে এ কাজ করে থাকে। সিপিএম সরকার নানা অজুহাতে কলকাতার নানা জায়গায় মিটিং-মিছিল বন্ধ করা শুরু করেছিল। ১৯৮৪-র ১৬ অক্টোবর সিপিএম সরকার তৃণমূল সরকারের মতোই টিফিনের সময় সরকারি অফিসে স্লোগান, করিডরে মিটিং বন্ধ করতে সার্কুলার জারি করেছিল। বিরোধীদের ডাকা বনধ ভাঙতে সার্কুলার জারি, কর্মচারীদের বনধের আগের দিন অফিসে আটকে রাখা তারাই শুরু করে। এমনকি বনধ করার অপরাধে এসইউসিআই(সি)-র বিরুদ্ধে মামলাও তাদের সরকারের আমলেই হয়েছে। তৃণমূল ক্ষমতায় এসেই বনধ, ধর্মঘট, আন্দোলন বিরোধী হুঙ্কার দিয়ে একই ভাবে কর্পোরেট মালিকদের আস্থা পেতে চাইছে। বিজেপি তার শাসিত রাজ্যে একই কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি হরিয়ানার বিজেপি সরকার শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সভা, মিছিল প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেছে।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের মুনাফার মোটা অংশ আসে অস্ত্র বেচে

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্যাঙ্গালোরে অ্যারো ইন্ডিয়ার এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে বলেন, ২০২৪-'২৫-এর মধ্যে ভারতের অস্ত্র রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে ভারতের অস্ত্র রপ্তানি ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যে ভারত অস্ত্র রপ্তানি ২৩৩ শতাংশ বাড়াতে চায়। কেন ভারত অস্ত্র ব্যবসায় এত জোর দিচ্ছে? প্রতিরক্ষা বা দেশরক্ষাই যদি অস্ত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্য হবে তা হলে রপ্তানি কেন?

ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের ৮০ শতাংশই ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। রিলায়েন্স, টাটা, আদানি গোষ্ঠী অশোক লে ল্যান্ড, মাহিন্দ্রা প্রভৃতি ছশোর বেশি কোম্পানি এখন অস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। শোনা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে আরও দুটি প্রতিরক্ষা করিডর তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে বহু বেসরকারি কারখানা হবে। ভারতের 'ডিফেন্স প্রোডাকশন পলিসি ২০১৮'র লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে আকাশ যুদ্ধের নির্মাণে দ্রুত দেশকে শীর্ষ পাঁচের মধ্যে নিয়ে যাওয়া।

ভারত অস্ত্র বিক্রির জন্য ৭৫টিরও বেশি দেশের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট তেজস বিক্রির জন্য কথা চলছে আর্জেন্টিনা এবং মিশরের সঙ্গে। সিঙ্গাঁপুর, মালয়েশিয়া, বাহরিন, দুবাইয়ে কয়েক বছর আগে থেকেই অস্ত্র রপ্তানি চলছে। অ্যারোনটিক্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির প্রজেক্ট ডিরেক্টর সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, অন্তত ১৬টি দেশ বিমান কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মরিসাস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সামরিক হেলিকপ্টার কেনার বিষয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গায়নার সঙ্গে ভারত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে পেট্রল চালিত জলযান রপ্তানির বিষয়ে। গত বছর ফিলিপিন্সের সাথে ৩৭৫ মিলিয়ন ডলারের ব্রহ্মোস মিসাইল রপ্তানির চুক্তি হয়েছে। এক প্রতিরক্ষা অফিসারের সংযোজন—দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, আরব, আমিরসাহি, সৌদি আরব সহ দশটি দেশের সঙ্গে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির ব্যাপারেও কথা চলছে। ২০২২ সালে আর্মেনিয়া ভারত থেকে পিনাকা মাল্টিব্যারেল রকেট লঞ্চার, রকেট, অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য চুক্তি করেছে। আরও বহু উদাহরণ আছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে মনমোহন সিং নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আনা উদার অর্থনীতিতে জোর দেন। এর ফলে অস্ত্র রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। সম্প্রতি রাজ্য সভায় উত্থাপিত এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত দু'বছরে ভারতের অস্ত্র রপ্তানি ৭০ শতাংশ বেড়েছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পর্যবেক্ষণ ভারতের তিনটি অস্ত্র কারখানা হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিক্স লিমিটেড, অবনী এবং ভারত ইলেক্ট্রনিক্স বিশ্বের ১০০টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

ভারতের উৎপাদন সংস্থা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড ওএফবি অস্ত্র ছাড়াও অস্ত্রের যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন কেমিক্যাল এবং বিস্ফোরক, প্যারাসুট, লেদার এবং সেনাদের জামাকাপড় অন্তত বিশ্বের ৩০টি দেশে রপ্তানি করে, যার মধ্যে জার্মানি, বেলজিয়াম এবং আমেরিকাও রয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প এখন বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির সমতুল্য। ২০২১ সালে মিলিটারি খাতে ভারতের বরাদ্দ ছিল ৪.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সামরিক বাজেটের দিক থেকে ভারত বিশ্বে তৃতীয়। প্রথম স্থান আমেরিকা (৭৩২ বিলিয়ন ডলার), দ্বিতীয় চিন (২৬১ বিলিয়ন ডলার)।

অস্ত্র আমদানির বিষয়েও ভারত দ্বিতীয়, প্রথম স্থানে সৌদি আরব। অস্ত্র উৎপাদন এবং আমদানি উভয় ক্ষেত্রে কেন ভারত এত জোর দিচ্ছে? কারণ এখানেই রয়েছে বিপুল মুনাফা অর্জনের নিশ্চিত নিরাপদ সুযোগ। এই একটি মাত্র বাজার যেখানে মন্দার ছায়া নেই। প্রায় সব সময়ই তেজিভাব। কারণ এখানে সাধারণ মানুষ ক্রেতা নয়, ক্রেতা সরকার।

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকার অস্ত্র উৎপাদন করে, আমদানি করে। আবার সরকার এবং বৃহৎ পুঁজির মালিকরা বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। ফলে সমর শিল্পই অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের যুগে শিল্পায়নের মূল ধারা। মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ছোট-বড় সব পুঁজিবাদী দেশই অর্থনীতির সামরিকরণে জোর দিয়ে থাকে। কারণ বাকি সব শিল্পেই মন্দা। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির জরুরি প্রয়োজন হল, সমর শিল্পের বাজার তৈরি করা, তেজি ভাব ধরে রাখা। সেই কারণে মানুষ না চাইলেও তারা যুদ্ধ বাধায়, যুদ্ধের হাওয়া তোলে পুঁজিপতিরা। এ তার অস্তিত্বের শর্ত। যুদ্ধ মানবসভ্যতাকে বহু ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেলেও, পুঁজিপতিদের কাছে যুদ্ধ আসলে লাভজনক ব্যবসা। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে হলে যুদ্ধবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে তীব্র করতে হবে।

'এনকাউন্টার' অপরাধ দমনের হাতিয়ার হতে পারে না

এখন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সেমিনার থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকান — সর্বত্রই কান পাতলে 'এনকাউন্টার' বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞদের' মতামত শুনতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরপরই এনকাউন্টারে মৃত্যুর খবর আসে, তরঙ্গায়িত কোলাহল থেমে গিয়ে আবার তরঙ্গায়িত হয় আর একটা এনকাউন্টারের খবরে। এভাবেই চলতে থাকে। একটা 'গণতান্ত্রিক' দেশের পক্ষে এ বড় সুখের সময় নয়।

১৯৯০-এর পর থেকে এনকাউন্টার শব্দটা এ দেশে বেশি করে শোনা যেতে থেকে। ২০০০ সালের মধ্যে শহরের মাফিয়াদের খতম করার কথা বলে মুম্বই পুলিশ 'এনকাউন্টার হত্যা' শুরু করে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার অজুহাত দেখালেও আসলে সাজানো (ফেক) এনকাউন্টারে খুন করাটা পুলিশের অধিকারে পরিণত হতে থাকে। যে কোনও মানুষকে সন্ত্রাসবাদী বা মাফিয়া নাম দিয়ে এইভাবে খুন করা শুরু হয়। ধীরে ধীরে সারা দেশেই এনকাউন্টার খুন ছড়িয়ে পড়ে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকায় এনকাউন্টার নিষিদ্ধ। এনকাউন্টার হলে, যে পুলিশ কর্মী এনকাউন্টার করল তার বিরুদ্ধেখুনের মামলা হওয়ার কথা। তারপর তাকে কোর্টে প্রমাণ করতে হবে সে নির্দোষ, প্রমাণ করতে হবে সেটা সাজানো এনকাউন্টার নয়। ২০১১ সালে প্রকাশ কদম বনাম রামপ্রসাদ ভীষ্ম মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনি হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেই পুলিশের মৃত্যুদণ্ড হওয়া দরকার। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনকাউন্টারের পর পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও মামলাই দায়ের হয় না, হলেও শেষপর্যন্ত পুলিশের কোনও শাস্তি হয় না। এ ভাবেই সমস্ত আইন, বিচার প্রক্রিয়া ও মানবাধিকারকে অস্বীকার করে চলতে থাকে এনকাউন্টার খুন। অনেকেরই মনে আছে ২০১৯-এ হায়দরাবাদে এক ভেটেনারি চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের দায় চাপিয়ে চারজনকে 'এনকাউন্টারে' হত্যা করেছিল পুলিশ। সোস্যাল মিডিয়ায় অনেক সমর্থনও মিলেছিল। তিন বছর পর ২০২২-এ বিচারপতি সিরপুরকরের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন জানায় ঠাণ্ডা মাথায় নিরপরাধদের অপরাধী সাজিয়ে খুন করেছিল পুলিশ।

বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের জন্মগত, আর আইন এই অধিকারকে রক্ষা করবে। সেই আইনের শাসন বলে, যে কোনও অভিযুক্তেরই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। কোনও অভিযুক্ত যতক্ষণ না আদালতে দোষী প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে নির্দোষ হিসাবেই ধরতে হবে। কিন্তু ভারতে পুলিশ নিজেই আইন হয়ে উঠছে। বিচারের আগেই অভিযুক্তকে সাজানো এনকাউন্টারে মেরে দিচ্ছে। ইউনাইটেড নেশন হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল তাই এনকাউন্টারকে খুন হিসাবেই চিহ্নিত করেছে।

এই এনকাউন্টার খুনের পিছনে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন একটা বড় কারণ। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি নীতি-আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি করে না। একসময় মালিকের দেওয়া টাকা দিয়ে এই রাজনৈতিক দলগুলি মাফিয়া মস্তান পুষতো, এখন বাহুবলী মাফিয়ারাই এইসব রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রী। ১৯৯৩-এর জুলাই মাসে নরসিমহা রাও সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব এন এন ভোরার নেতৃত্বে কমিটির রিপোর্টের ভাষায়, দেশের নানা জায়গায় ক্রিমিনাল গ্যাংয়ের সাথে পুলিশ, আমলাতন্ত্র, রাজনীতিবিদদের আঁতাত এখন খুবই পরিষ্কার।

শুধু পাড়ায়-মহল্লায় গ্রামে-শহরে নয়, সংসদীয় রাজনীতিতে অপরাধীদের সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। ২০০৪ সালে সংসদের ২৪ শতাংশ সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় ছিল। ২০০৯ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৩০ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৩৪ শতাংশ। ২০১৯ সালে ৪৩ শতাংশ সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় আছে। এই আশঙ্কাজনক চিত্র কম বেশি প্রায় সব রাজ্যের বিধানসভাগুলিতেও দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান ভারতবর্ষে অপরাধের মৃগয়াক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় ৪০৩ জন সদস্যের অর্ধেকের বেশি ২০৫ জনের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস আছে। এদের মধ্যে আবার ১৫৮ জনের নামে মারাত্মক অভিযোগ আছে, যাদের অনেকে খুন, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ কেসে বন্দিও হয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশে বিগত ৬ বছরে ৯৪৩৪টা এনকাউন্টার হয়েছে, দিনে গড়ে ৫টা করে। এতে ১৭০৮ জন আহত হয়েছে, প্রায় ১৬০ জন মারা গেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজেপির সাথে যুক্ত কোনও মাফিয়ার বিরুদ্ধে এনকাউন্টার হয়নি। কোনও রাজ্যেই শাসকদলের স্নেহধন্য মাফিয়া এনকাউন্টারে মরে না। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, সাজানো এনকাউন্টারে মেরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক। রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশ-প্রশাসনের দুষ্টচক্রই নিজেদের কায়েমি স্বার্থে এনকাউন্টারের নামে আইন হাতে তুলে নেয়।

এ ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা গণতন্ত্রের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। একটা এনকাউন্টারের আগে ও পরে তারা কৌশলী উপস্থাপনায় এমন বাতাবরণ তৈরি করে, যেন অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলাটা বৈধ। এনকাউন্টার নিয়ে একটার পর একটা চলচ্চিত্র হচ্ছে। অব তক ছাপ্পান, খাকি, চুলবুল পাণ্ডে, সিংঘম এমন অনেক চলচ্চিত্র যেখানে দেখা গেছে এনকাউন্টারের পর দর্শক উল্লসিত হয়েছে। 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' পুলিশকে সেখানে হিরো হিসাবে দেখানো হয়। এমনকি একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'এনকাউন্টার' নামেই একটা জনপ্রিয় হিন্দি সিরিয়াল চলছে। এ ভাবে জন-মানসে এনকাউন্টারের পক্ষে একটা সমর্থন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। একদল সাধারণ মানুষ, কোনও দুষ্কৃতীর এনকাউন্টারে মৃত্যু হলে আনন্দিত হন। আইনের ওপর, বিচারব্যবস্থার ওপর ভরসা হারানো মানুষ মনে করেন, বেশ হয়েছে, এদের এমন করেই মারা দরকার। বাস্তবে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখেছেন, বিচারের দীর্ঘসূত্রতার জন্য, আইনের মার-প্যাঁচে, টাকার জোরে, রাজনৈতিক সম্পর্কের জোরে অপরাধীরা সাজা পায় না। অসহায় মানুষ অত্যাচারিত হতে হতে, তীব্র রাগ ক্ষোভ বিদ্বেষে অপরাধীর ধ্বংস দেখতে চায়। অত্যাচারী শাসক এই সুযোগকে কাজে লাগায়। আইনের শাসনকে ধুলিসাৎ করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। যে কোনও প্রতিবাদী মানুষের গায়ে মনগড়া কিছু অভিযোগের কালি ছিটিয়ে তাদের হত্যা করার রাস্তা প্রশস্ত করে রাখে। এই অবস্থায় যদি সত্যিই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, ন্যায়বিচার পেতে হয়, অপরাধ মুক্ত সমাজ সৃষ্টি করতে হয়, দলমতনির্বিশেষে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনকে তীব্রতর করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে প্রচারসভা

শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মরণে অনুষ্ঠান

১১ মে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের শহিদ দিবস। ওই দিন নদিয়ার অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগর পৌরসভার দ্বিজেন্দ্র সভাকক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট নাগরিক শিবনাথ চৌধুরী ও শঙ্করেশ্বর দত্ত। গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন শহিদ জীবনী রচয়িতা সম্পদনারায়ণ ধর।

বর্তমান সময়ে এই বিপ্লবীর জীবনী আরও বেশি করে চর্চার প্রয়োজনের কথা সকলেই বলেন। কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে বসন্ত বিশ্বাসের আবক্ষমূর্তিপ্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে অনুষ্ঠান থেকে। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কমল দত্ত।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
ঝাড়খন্ডে এআইডিএসও-র উদ্যোগে বুকস্টল

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের বই পড়ুন
● বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময় ● সোশ্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করেই বিপ্লবী দলকে এগোতে হয় ● শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য
● কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই(সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল
● মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে

হরিয়ানায় মিছিল, বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা বিজেপি সরকারের
তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

হরিয়ানার বিজেপি সরকার ভিওয়ানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পঞ্চকুলায় সমস্ত ধরনের বিক্ষোভ, মিছিল, সভার উপর নানা নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে। এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য তথা হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান ১৮ মে এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার সংসদ-বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর বন্ধ করলে তা গণতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্র। তিনি সরকারের এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আহ্বান জানান। দলের ভিওয়ানি জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

আন্দোলনের চাপেই 'ডিপ্লোমা ডাক্তার' সিদ্ধান্ত থেকে পিছোতে হল সরকারকে

'ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি এক্সপার্ট কমিটি। পরিবর্তে হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল তৈরির যে কথা কমিটি বলেছে সেটাও আপত্তিজনক।' ১৬ মে এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশিত ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরির থেকে স্বাস্থ্যদপ্তর যে কিছুটা সরে আসতে বাধ্য হয়েছে, তা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের আন্দোলনের জয়।'

তিনি বলেন, তিন বছরের কোর্সের মাধ্যমে হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল তৈরির নামে সরকার যে নতুন হেলথ ক্যাডার তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করছে তার আমরা বিরোধিতা করছি। কারণ শূন্য পদে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ যথাযথ হচ্ছে না। এমবিবিএস ডাক্তার, ডেন্টাল সার্জেন, আয়ুষ ডাক্তারদের কোনও রকম নিয়মিত নিয়োগ হচ্ছে না, স্নাতকোত্তর পড়াশোনার পরে স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার হিসেবে অথবা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার জন্য আবেদন করেও চাকরি পাচ্ছেন না। নার্সরা চাকরির দাবিতে রাজপথে নামছেন, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, ডেপুটেশন দিচ্ছেন। যে প্যারামেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে বসে আছেন, তাঁরা নিয়োগের দাবি তুলছেন। এঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন?

এঁদের নিয়োগ না করে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নতুন ধরনের হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়োগ করা ইত্যাদি চূড়ান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সস্তাশ্রম তৈরি ও ব্যবহার করার নামান্তর। আমরা অবিলম্বে আবেদন করছি শূন্য পদে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ নিয়মিত করতে হবে এবং এই ধরনের 'হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল' নামক নতুন ক্যাডার তৈরি করার পদক্ষেপ রদ করতে হবে।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে দেওয়াল লিখন

ওড়িশা

শিলিগুড়ি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com